মূর্ছনা

==========

www.MurchOna.com

Archives of eBooks, Music & Videos

বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত

==========

suman_ahm@yahoo.com

দিনগুলো

চন্ডী ভট্টাচার্য

নতুন বছরের নতুন দিনে ঘুমন্ত অমলেশের মনে দেয়ালায় অনুভূতি। -- একটা মাঠ। লোকে-লোকারণ্য একটা মাঠ। সেই মাঠের প্রান্তে মঞ্চের ওপরে বাঙালি কবিদের আজকের প্রজন্ম। সুবোধ সরকার, পিনাকী ঠাকুর, শ্রীজাত, মন্দাক্রান্তা সেন ...।

মাউথস্পিকারের সামনে দাঁড়িয়ে উদাত্ত গলায় কবিতা পাঠ করে চলেছেন কবি জয় গোস্বামী। তিনি বলছেন --

'স্বপ্নে দেখি : মাসিমা পাঁচিল ডিঙোচ্ছেন।
ও-বাড়িতে পেঁপে পড়ল। ওরা কেউ
ওঠেনি এখনো।
ভালো করে ভোর হয়নি। এ-বাড়ির পেঁপে গাছ
এ-সব বজ্জাতি করে। আজকাল বাতাবি গাছকেও
শেখাচ্ছে ও-সব। বেশ, শেখাক যা খুশি।
মাসিমারও রাত জেগে পাহারা! ...'

একেবারে সামনের সারিতে বসে আছেন অমলেশ। জয়ের কবিতায় হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির আনন্দে বিভোর। সেই কোনও ছোট্টবেলাকার জীবন। দুষ্টুমিতে ভরা দিন। ছোটাছুটি করে খেলে বেড়ানো। এ-গাছ থেকে টিয়া কি শালিক পাখির বাচ্চা পেড়ে আনা, ও-গাছ থেকে ফল-পাকড়। একবার তো দত্তদের বাগানে ঢুকে ...। সেসব তো বলা যায় না সবার সঙ্গে। তা যেন শুধুই নিজের অনুভবের। জয় গোস্বামী যেন সেই অনুভবকেই উস্কে দিচ্ছেন তাঁর কবিতাটির ছন্দে এবং পংক্তিতে।

অমলেশের মনে পড়ছে -- অমু নামের একটি ছেলের কথা। ঢোলাঢালা, দড়ি-ওয়ালা একটা হাফপ্যান্ট পরা অমু, স্কুল পালিয়ে নিজেদের পুকুরে ঝোপের আড়ালে ছিপ ফেলে বসে যাওয়া অমু, বিরক্তিতে অস্থির। তার প্রায় অনুক্ষণের সঙ্গী অরো তাকে উপদেশ দিচ্ছে, 'আজকে তোর কপালে মাছ নেই, অমু। শুধু শুধু বসে থাকা।' হতাশ ও বিরক্ত অমু অরোর কথায় যুক্তি খুঁজে পেয়ে আপন মনে বলছেন, 'ঠিক বলেছিস। সেই থেকে বসে আছি, শালা এট্টা চ্যাঙ-ব্যাঙও যদি ছিপির ধারে কাছে আসে। আজকে যে কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠিলাম।'

তক্ষুনি চটজলদি উত্তর অরোর মুখে, 'মনে করে দ্যাখ হাটকুড়ো বিপিন কুন্ডুরি দেখিলি কি না! কুন্ডু-র মুখ দেখলিই তো অযাত্রা!'

অমু কিন্তু মানতে নারাজ তা, 'ভ্যাট, লোকের নামে যা তা বলিস ক্যান রে ?'

অরো অবলীলায় নিজের দোষ অস্বীকার করে বলল, 'আমি কী বলব, লোকেই তো বলে। সেদিন তিনুর ঠাম্মাও তো বলছিল।'

তিনুর ঠাম্মা যখন বলেছে, তখন সত্যি হলেও হতে পারে। অমু তাই কিছুটা দমে গিয়ে বলল, 'বিপিন কুন্ডুর সঙ্গে দ্যাখা হলি তো !'

'ক্যান দ্যাখা হবে না ক্যান ?'

'কী করে হবে ? উরা তো কালকের আগের দিনই ইন্ডিয়ায় চলে গেছে।'

অরো জানে না তা। পাঁচ-ছ'দিন ধরে মামার বাড়িতে গিয়েছিল সে। গতকাল রাতে ফিরেছে। তাই কথা ঘুরিয়ে বলল, 'তালি মাদারি বুড়িরি দেখিছিস। ও-উ তো অযাত্রা। নালি মাছে এট্টা ঠোকরও দেবে না ক্যান, বল ?'

অমু শুনছে, কিন্তু তার দৃষ্টি রয়েছে ফাতনার দিকে। ফাতনাটা অবশ্য প্রায় স্থির। মাঝে মাঝে তাতে মৃদু কম্পন এলেও তা ছিপ টেনে তোলার মতো যথেষ্ট নয়। সেদিকে তাকিয়ে একটু ইয়ার্কির ভঙ্গিতে অরো বলল, 'আমি অবশ্য এট্টা মন্তর জানি। মনে মনে সেটা বললিই মাছ আসে জলের মদ্যি ঘাই মারবে। বলব সেডা ? বলতিছি কিন্তু -- ওর কথা শেষ হতে না হতেই ফাতনার কাছে জলে একটা ঘুপ শব্দ, 'ওই দ্যাখ।'

চকিত অমু ঠিকই তাকিয়েছে। কিন্তু না, মাছের কোনও খোঁজখবর নেই। তার অন্যমনস্কতার ফাঁকে বার কয়েক একই শব্দ হতেই অমু ধরে ফেলল ব্যাপারটা। অরো ঢিল ছুড়ছে। আরও কয়েকবার ওরকম করতেই সে ছিপ ফেলে রেখে তাড়া করল অরোকে।

অরো দৌড়তে লাগল। পেছনে পেছনে অমু। অরো হাসছে, মাঝে মাঝে দুলকি দিচ্ছে।

একসময় ধরা পড়বার উপক্রম হতেই পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। আর ঠিক তখনই অমু চেঁচিয়ে উঠল, 'হেই -- অরো, যাহ, আমার ছিপ, আমার ছিপটা --' বলতে বলতে জলে ভাসমান ছিপটাকে ধরবার জন্যে নিজেও পুকুরে ঝাঁপ দিল সে। এ সময়েই ঘুমটা ভেঙে গেল অমলেশের। প্রথমে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব, ধড়-মড় করে বিছানায় উঠে বসে পরিবেশ-পরিস্থিতি সমঝে নেওয়া। তারপর সামলে ওঠার অপেক্ষা।

একটু সামলে নিলেও শরীরে ঘুমের রেশ। চোখ ঢুলুঢুলু। আলসেমি কাটাতে টানা একটা হাই তুললেন অমলেশ। আড়ামোড়া খেলেন একটু। হেসে ফেললেন তারপর। স্মৃতি ! কী অদ্ভুত এই স্মৃতি। জীবনের কত টুকরো ঘটনাই তো কোথায় হারিয়ে গেছে। শেষে একদিন বাদে স্বপ্নে এল কিনা এই ঘটনাটাই ! কতদিন আগের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাই না এটা। মনের গহনে আজও যে এটা উজ্জ্বল হয়ে ছিল -- ভাবাই যায়নি।

কিন্তু অমলেশ একটু আগে দেখা স্বপ্নটাকে বেশিক্ষণ আমল দিলেন না মনের মধ্যে। পায়ের দিকের জানলাটার একটা পাল্লা খোলা। সেই খোলা জানালা পথে চোখ চলে গেল বাইরের দিকে। বাইরে খোলা নীল আকাশ। তা থেকে বিচ্ছুরিত একরাশ আলোর স্রোত এ-ঘর থেকে ও-ঘরময় যেন সাঁতরে বেড়াচ্ছে।

বাথরুমে জল পড়ার শব্দ পেলেন অমলেশ। তনিমা কি ? কমাস ধরে কোথায় যেন চাকরির জন্যে কোচিং নিচ্ছে ও। আজকাল তাই সকাল সকাল বেরোতে হয়। ও-ই বোধহয় বাথরুমে।

হ্যাঁ, তনিমাই। নিশ্চিত হন অমলেশ। ছোটবেলা থেকেই অভ্যাসটা গড়ে উঠেছে। বাথরুমে ঢুকলে এখনও সময়ের দিকে খেয়াল থাকে না তনিমার। ছেলেবেলায় যেটা ছিল নিছক ভাল লাগা, এখন তা-ই যেন বাতিকে পরিণত হয়েছে। এক নাগাড়ে জল ঢালছে তো ঢালছেই। সুতরাং সে ছাড়া আর কে-ই বা হতে পারে এত সকালে চান করবার মতো ? এ বাড়িতে সেরকম বলতে এক ছিলেন তিনি। সকাল সকাল ওঠা,

সবার আগে স্নান। বিমলা মাঝে মাঝে রাগ করত। বলত, 'এত সকালে চান করলে ঠান্ডা লেগে যাবে যে ! কিছু একটা বাঁধিয়ে বসলে আমি কিন্তু কোনও ঝামেলা পোহাতে পারব না বাপু, এই বলে রাখলাম।' নাহ, আর কোনওদিন বিরক্ত হতে হবে না বিমলাকে। কেননা গতকালই সবার সব ঝামেলার পরিসমাপ্তি ঘটে গিয়েছে। আজ তিনিও মুক্ত বিহঙ্গ।

বিছানা থেকে নেমে অমলেশ বইরের বারান্দায় চলে এলেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাঁর ভ্রূ-দ্বয়ে কুঞ্চন। কী যে হচ্ছে এ-বাড়ির লোকজনের ! কোনও একটা কথা যদি ঠিক-ঠাক মনে থাকে কারও। মেমারি কি কম দূরের পথ ! বিকেল কিংবা সন্ধের আগে তো অন্তত সেখানে পৌঁছনো দরকার ! অমলেশের মুখে স্পষ্ট বিরক্তি।

পরিকল্পনাটা আগেরই। রিটায়ার করবার পর তিনি কী করবেন, কোথায় কোথায় যাবেন -- কত ভাবনা। মেমারিতে যাননি বহুদিন। প্রায় আট-নয় বছর। সেখানে মামি আছেন, মামাতো ভায়েরা আছে। বিনিমাসি তো কলকাতার পাঠ উঠিয়ে সেই মেমারিতেই ফিরে গেছেন। সুলতাকাকিমাও বেঁচে আছেন আজও। তাঁদের সঙ্গে দেখা হবে। পুরোনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সুখ-দু:খের গল্প হবে -- কত যে পরিকল্পনা !

গতকাল শেষবারের মতো অফিস থেকে ফিরে বিমলাকেই আগে জানিয়েছিলেন তা, 'ভাবছি আগামীকাল মেমারি থেকে একবার ঘুরে আসব।'

'মেমারি !'

'হ্যাঁ।'

'হঠাৎ করে মেমারি প্রীতির কারণ ?'

'হঠাৎ না ঠিক। যায়নি তো অনেক বছর। কদিন ধরে যাব যাব ভাবছিলাম। এতদিন তো তেমন যাইওনি কোথাও। আজ থেকে আবার অফিসে ছোটাছুটিও শেষ। এই মন

খারাপের দিনে কোথাও ঘুরে আসতেও তো মন চায়, সবারই চায় -- না কি বলো ? তা ছাড়া মেমারিতেই আমার যা আত্মীয়-স্বজন। এতদিন না যাই, এবার তো অন্তত একবার খোঁজ-খবর নেওয়াটাও কর্তব্য ?'

'ইস, কে কার জন্যে যে কর্তব্য করে ! আমি ভুলে গেছি ভেবেছ ? সেই যে পুলুর বিয়ের সময়, নিমন্ত্রণ করে তো জনে জনে চিঠি পাঠিয়েছিলে। কই, তখন তো ও তরফ থেকে কেউ কর্তব্য সারতে আসেনি !'

'কেন আসবে ? তুমি কি ওদের আমার আত্মীয় বলে কখনও ভেবেছিলে ? বরং ভেবেছিলে গরু-ছাগল। আমি তো পই পই করে বলেছিলাম রজত যাক। গিয়ে নেমন্তন্নটা সেরে আসুক। তুমিই তো বলেছিলে, না -- রজতের কাজ আছে। ও যেতে পারবে না। এখন সেসব কথা বলে লাভ আছে ? গ্রামের লোকেরা এমনিতে একটু বেশি সেন্টিমেন্টাল হয়। আর তা-ই বা বলি কেন, মেয়ের বিয়েতে শুধুমাত্র নেমন্তন্নের কার্ড পাঠালে তোমার আত্মীয়রাও নিশ্চয়ই আসত না। আসত কি ?'

'আমার আত্মীয়রা তোমার ওই বর্ধমানের মেমারিতে লোকগুলোর মতো গেঁয়ো ভূত নয়, আসত ঠিকই। কেননা তারা ভদ্রতা বোঝে।'

'না, মোটেই তারা আসত না।'

'আসত আসত। কার্ড পাঠিয়ে নিমন্ত্রণটা করে দেখলেই পারতে।'

'তর্ক কোরো না। তোমার আত্মীয়দের আমি একটু তো অন্তত চিনি।'

'আমার থেকে বেশি নিশ্চয় চেনো না ?'

অমলেশ বলতে যাচ্ছিলেন -- তাঁ বোন মৌমীর সাধ-এর সময় যে নিমন্ত্রণটা করা হয়েছিল বিমলার বাপের বাড়িতে, সেটা ছিল নেহাতই একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠান। নিকট আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে কাজটা সারতে চেয়েছিলেন তিনি। অথচ বিমলার বাপের বড়ি

থেকে কেউ-ই আসেনি। অন্তত একজনও তো আসতে পারত ? তারপর একবার দুর্গাপুজোর সময় ওদের বাড়ির সবাইকেই পুজোর জামা-কাপড় পাঠিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ওদের এখান থেকে জামাকাপড় এসেছিল কেবল মেয়ে-জামাই আর নাতনির জন্যে। এখনও সেরকমই আসে। মনে করলে আরও কত কিছুই তো বলা যায়। কিন্তু বলতে পারলেন না অমলেশ। সেসব কথা তোলা মানে আরেক প্রস্থ কথা কাটাকাটি।

তাই কথা ঘুরিয়ে বলেছিলেন, 'বেশ, তোমার আত্মীয়দের আমার থেকে না হয় তুমিই বেশি চেন। এ-ও না হয় মেনে নিচ্ছি, আমার বেশিরভগ আত্মীয়ই গেঁয়ো। কিন্তু এটা তো জানো -- যার আত্মীয় তার কাছে ? আমার আত্মীয়-স্বজনকে যদি তোমারও আত্মীয়-স্বজন মনে না করতে পারো, তা হলে তাদের দিকটা তো একা আমাকেই ভাবতে হবে ? -- কাল মেমারি যাচ্ছি -- এটা ফিক্সড। আগেভাগে বলে রাখলাম। তুমি পারলে তুমি। নতুবা তনিমা যেন একটু সকাল সকাল ডেকে দেয়।'

বিমলা তাঁর কথা রাখেনি। তনিমাও। হয়তো বা রাগ করে তনিমাকে কিছু বলেইনি বিমলা।

অমলেশ মনোক্ষুন্ন হলেন। অনুভব তাঁকে জানান দিল -- রিটায়ার করবার পর এই প্রথম যেন এ-বাড়িতে তাঁর কথার গুরুত্ব দিতে চাইল না। কিংবা আজ থেকে যেন তাঁর কথার গুরুত্ব অনেকটাই কমে গেল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে, নিজের অতীত আর আজকের এই বর্তমানের পার্থক্যের পরিমাণ মাপতে মাপতে, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন অমলেশ রায়।

দশটা তেরোর বর্ধমান লোকালে উঠে পড়ার সময়েও অমলেশের বুকের মধ্যে বিষন্নতার চোরা স্রোত। ভাগ্যক্রমে জানলার কাছেই বসার একটা জায়গা পেয়ে গেলেন। স্বভাবতই মনটা যেন একটু চনমনে। তাঁর মনে পড়ল, কলেজ জীবনে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দল বেঁধে সেই ট্রেনে যাতায়াতের দিনগুলোর কথা। বিশেষত গরমকালে ভিড়ে ঠাসা ট্রেনে জানলার কাছে বসা নিয়ে যেন ছিল অদৃশ্য প্রতিযোগিতা।

তারও আগে, সেই ছোটবেলায় ট্রেনের জানলা ছিল চলমান ছবির ক্যানভাস।

অমলেশ বাইরের দিকে তাকালেন। তাকিয়েই রইলেন। কিছু সময় পরে ক্যানভাসে সবুজ ছাপ, অন্য রং। শহর থেকে কিছুটা দূরেই বৈচিত্র্যে ভরা প্রান্তর যেন আজও অটুট। কোথাও ধান খেত, অন্য ফসলের খেত। কোথাও কোথাও জলাভূমির হাতছানি। এখানে-ওখানে পানকৌড়ি, বক কি মছরাঙাদের চকিত-চমক। দূরে দিগন্তরেখায় গাছগাছালির ফাঁকে উঁকি দেওয়া অন্য লোকের ছবি। এসব চেনা। বহুবার দেখা।

তবু আজ সব কিছু নতুন করে দেখতে ইচ্ছে করছিল। এতদিন বাদে আবার যেন ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল হারিয়ে যাওয়া শৈশবের সেই দিনগুলোতে।

তাঁর চোখের সামনে যেন ভেসে উঠল বাবা-মা'র সঙ্গে, কাকা-কাকিমার সঙ্গে জীবনে প্রথমবার ট্রেনে চেপে বসেছে ছোট্ট অমু।

দেশ ছেড়ে আসার যন্ত্রণায় আর সবাই বিষন্ন মুখে চুপচাপ বসে আছেন, কিন্তু অমুর যেন তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

কান পেতে সে কখনও শুনছে ট্রেনের কু-ঝিক-ঝিক ছুটে চলা। কখনও বাইরের দিকে তাকিয়ে অচেনা নানান কিছুর প্রতি বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জেনে নিতে চাইছে, 'হুই যে হুই লাল মতন বাড়িটা, ওটা কাদের বাড়ি বাবা ? বাবা সাধ্য মতো উত্তর দিচ্ছেন। ওভারব্রিজ, মালগাড়ির গোলাকৃতি ওয়াগন, প্ল্যাটফর্ম, আরও অনেক কিছু যার কয়েকটা বাবা চেনেন, কয়েকটা তাঁরও অচেনা।

মা মাঝে মাঝে বাবাকে রেহাই দিতে মৃদু ধমকে উঠছেন, 'আহ অমু ! তুই বড্ড জ্বালাস। চুপ করে দাঁড়া তো এটু।'

অমু ধমক খাবার পর সাময়িক সময়ের জন্যে শান্ত, প্রশ্নহীন। কিন্তু জানালার বাইরে

তো অন্য জগৎ এবং তার হাতছানি। সে এড়াবে কী করে সেই ডাক ? সুতরাং আবার জানলায়। কাকিমা অবশ্য মাঝে মাঝে বলে উঠছেন, 'জানলায় যাসনে, এই অমু। আহ, দ্যাখো, হাত বাইরে দেয় আবার !' অমু তা শুনছে মাত্র, সবধান হওয়ার চেষ্টা তার নেই। ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে যেন গাছ-পালা, বাড়ি-ঘর, মাঠ-ঘাট-রাস্তা -- পিছনে চলে যাওয়া সবকিছু মতো তার মনও সব কিছুকে পিছনে ফেলে সামনের দিকে ছুটে চলেছে।

সেসব দিন যে কোথা থেকে, কীভাবে হারিয়ে গেল। সে দিনগুলোর কথা মনে পড়লে আগে কিছু না হোক, এখন বুকের মধ্যে থিকই কষ্টটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

স্বজন হারানোর এবং দেশ ছাড়ার কষ্ট মা অবশ্য তেমনভাবে অনুভব করেননি। মেমারিতে তাঁর ভাইয়ের সংসার, অন্যান্য আত্মীয়ের বসবাস। আগে থেকে যাতায়াত ছিল। সুতরাং এলাকাটা নতুন মনে হয়নি তাঁর। বরং নিরাপদে এদেশে এসে পৌঁছতে পেরেছেন বলে কিছুটা স্বস্তি বোধ করতেন মা।

কিন্তু বাবা সারা জীবন মনে মনে জ্বলে মরেছিলেন। তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেননি দেশ ছাড়ার স্মৃতিকে। এদেশ তাই তাঁকে প্রবাসী করে রেখেছিল। তা ছাড়া মেমারিতেও বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারেননি বাবা। তাঁর মনে হত মেমারিতে যে আত্মীয়-স্বজন, তারা মূলত মায়ের, তাঁর নিজের আত্মীয়রা পড়ে রয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে বা বাংলাদেশে। সেজন্যে বাবাকে পুরোপুরি দায়ী করা যাবে না অবশ্য। কেননা মায়ের ওইসব আত্মীয়-স্বজন প্রায় রিক্ত মানুষটিকে প্রাপ্য সম্মানটুকু দেয়নি।

তবে শেষ বয়সে বেকবাগানের ভাড়াবাড়িতে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলেন বাবা। ছোট ছোট ঘর, অপ্রতুল আলো-বাতাস যেন তাঁকে দমবন্ধ করা অনুভূতি এনে দিত কখনও কখনও। তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে তিনি একে-ওকে ডাকতেন যখন-তখন। নাতি-নাতনি কিংবা বউমাকে ডেকে ডেকেও না পেলে ডাকতেন অমলেশকে, 'ও অমু, অমু রে --।' গিয়ে সামনে দাঁড়াতেই হত। বলতে হত, 'কেন ?'

বাবা কিছু বলার আগে কাশতেন খুব। তার মধ্যে একটু সামলে নিয়ে বলতেন, 'আর

যে পারি নে, বাবা। বুকির মদ্যি জ্বলে যাচ্ছে।'

অমলেশ সান্ত্বনা দিতেন। নতুন নতুন হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের খোঁজখবর পেলে বলতেন তাঁদের কথা। কিন্তু ওই জ্বালা তো শুধু রোগের জন্যেই ছিল না। জ্বালা ছিল স্বজন-হারানোরও।

তাই যেন বাবা প্রায়ই বলতেন, 'অমু রে, একবার আমারে দেশে নিয়ে যাবি ? শেষ বয়েসে দেশটারে খুব দেখতি ইচ্ছে করে রে --। যাবি নিয়ে একবার ?'

কথা দিতে পারেননি অমলেশ। কোনওদিনই পারেননি। মুখে বলতেন, 'দেখি।' কিন্তু জানতেন যে, তা সম্ভব নয়। পাসপোর্ট, ভিসা, যাতায়াত -- অত টাকা কোথায় তাঁর ? অত সময়ও ?

তবু অমলেশ মনে মনে ভাবতেন -- একদিন তাঁর নিজের খুব টাকা হলে, অন্তত হাতে তেমন টাকা এলে একবার অন্তত বাবাকে নিয়ে ঘুরে আসবেন নিজের জন্মভূমি থেকে।

সেদিনটা আর আসেনি। আর আসবেও না হয়তো। বাবাও তো নেই। পুরোনোদের মধ্যে এখন আছেন শুধু কাকিমা। কে জানে ও দেশের প্রতি এখনও তাঁর টানটা রয়ে গেছে কি না !

পাড়ার রাস্তাটিতে পা দিয়ে পরিবর্তনটা ভালভাবে টের পেলেন অমলেশ। আট-নয় বছর খুব বেশি না হলেও নিতান্ত কম দিনের নয়। এর মধ্যেই বদলে গেছে অনেক কিছু। এর-ওর মুখে কিছু কিছু শুনেছিলেন, এখন নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। রাস্তাটা পাকা হয়েছে। দুপাশে বেশ কিছু নতুন পাকা বাড়ি। বাজারে আবার দু-দুটো ভিডিও পার্লার। তার মানে বদলে যাচ্ছে এখানকার মানুষজন। যাবে না-ই বা কেন ? আজকাল বিজ্ঞানের যুগ, আধুনিকতার যুগ। এই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে সবকিছু এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, তফাত বিশেষ একটা চোখেই পড়ে না। তিনি এটা ভেবে আশ্বস্ত হলেন যে, এখানে

থাকাকালে নিজে একটা সময়ে যেটা চাইতেন, সে স্বপ্ন দেখতেন, মেমারি যেন তা-ই হতে যাচ্ছে।

তবে অমলেশ কল্পনা করতে পারেন, পরিবর্তন যতই আসুক, আন্তরিকতার অভাব বোধহয় হবে না এখানে। তার প্রত্যক্ষ পরিচয় তো পেলেন। পথে চেনা কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হতেই তাদের উষ্ণ আন্তরিকতায় মনে একরাশ মুগ্ধতা।

কাকার বড়িতে পৌঁছবার পর তো আবার বাতাসে খুশি খুশি ভাবের ওড়াউড়ি।

খবর পেয়ে মাঠের কাজ ফেলে রেখে চলে এল প্রশান্ত। চোখে-মুখে তখনও অবিশ্বাস, 'দাদা, তুমি শেষ পর্যন্ত এলে তা হলে! আমি তো ভেবেছিলাম আর আসবেই না।'

অমলেশ কী বলবেন? অভিযোগ তো মিথ্যে না। এখানে আত্মীয়-স্বজনের কারও কোনও অনুষ্ঠানে কখনও-সখনও আসার কথা থাকলে ছেলেকেই জোর-জবরদস্তি করে কি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পাঠিয়েছেন মাঝে মাঝে, নিজে আসেননি এ ক'বছরে একবারও। তাই অভিযোগ স্বীকার করে নিতেই হল, 'কী করব বল? উপায় থাকলে কি আসতাম না? কাজ-কর্মের তো শেষ নেই, না?'

প্রশান্ত বলল, 'তোমার শুধু কাজ আর কাজ। কেন, অফিস আদালত আর কেউ করে না, না কি?'

উত্তরে অমলেশের মুখে অপরাধী অপরাধী হাসি।

প্রশান্তর স্ত্রী রীনা বলল, 'এতদিন বাদে এলেন যখন, দিদিকে আনতে পারতেন। কতদিন যে দেখিনি দিদিকে।'

অমলেশ খানিকটা আঁতকে ওঠার ভঙ্গিতে বললেন, 'ওরে বাপ, রাস্তাঘাটের যা অবস্থা। নিয়ে এলে সাতদিন বিছানায় পড়ে থাকত নির্ঘাৎ। এখন শরীর যা হয়েছে

দ্যাখোনি তো !'

'কেন আগের চেয়ে দিদি কি একটু মোটা হয়েছে নাকি ?'

'একটু শুধু না, অনেকটা। আজকাল তাই রাস্তাঘাটে তুলতে ভরসা পাইনে।' হাসলেন অমলেশ।

হাসল রীনা-প্রশান্তরাও।

তারপর টুকিটাকি, একথা-সেকথা।

মাকে খবর দেওয়া উচিত ভেবে প্রশান্ত এক ফাঁকে তার সেজ মেয়ে তারাকে ডেকে নিল, 'যা তো মা, মাম্মাকে গিয়ে বলে আয় তো জেঠু এসেছে।'

তারা এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। দায়িত্ব পেয়ে এক দৌড়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

'কোথায় কাকিমা ? কোন ঘরে ?' অমলেশ উঠে দাঁড়ালেন। কাকিমাকে তাঁর প্রণাম করা হয়নি এখনও।

প্রশান্ত বারান্দার একদিকে একটা কামরা দেখিয়ে বলল, 'ওই তো, কামরাতেই আছে। যাও, ঘুরে এস।'

মুরলি বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট্ট কামরায় একটা চৌকির ওপরে প্রায় জবুথবু হয়ে বসে আছেন কাকিমা।

অমলেশ গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই কাকিমা মাথা তুলে চিনবার চেষ্টা করে বললেন, 'কিডা এলি ? অমু নাকি ?'

'হ্যাঁ, কাকিমা। আমি অমু।'

একগাল হেসে কাকিমা হাত বাড়ালেন সামনের দিকে, 'আয়, আয়, বস। বস আমার পাশে এট্টু। ওরে ও তারা, বাবারে খবর দিছিস তো ? বাড়ি আইছে তোর বাবা ?'

অমলেশ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি ব্যস্ত হবেন না। প্রশান্তর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।'

'দেখা হইছে ?'

'এই তো। এইমাত্র কথা বলেই এলাম।'

'ও। প্রশান্ত বাড়ি আইছে তালি ?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা আচ্ছা। তা বাড়ির সব ভাল তো ? বউমা কি আইছে নাকি ?'

'না। আমি একা এসেছি।'

'ক্যান, একা আসলি ক্যান ? বউমা আর ছেলে-মেয়েদের আনতি পারিনে ? কতদিন দেখিনি ওদের !'

'কী করে আনি বলুন ? আজকাল ওখানে চুরি-চামারি এমনই বেড়েছে যে, দুদিন কি একদিন, বাড়ি-ঘর ফেলে রেখে যে কোথাও যাব, সে উপায় পর্যন্ত নেই। এমনিতে ওরা ভালই আছে, ওই যেরকমটা থাকা যায় আর কী। তা -- আপনি কেমন আছেন ? ভাল আছেন তো ?'

'আমার কথা আর কী বলব, বাবা ? দেখতিই তো পাচ্ছিস। ওই আছি কোনওরকম।

চোখি ভাল দেখতি পাইনে বাবা। ডাক্তারে বলিছে চোখি না অপারেশন করি হবে না। ছানি পড়িছে চোখি।'

কত বয়স হল কাকিমার ? নব্বই ? নাকি তার আশেপাশে। অমলেশের মনে পড়ল প্রথম জীবনে কাকিমা যথেষ্ট সুন্দরী ছিলেন। কাকার বিয়ের সময় নিতবর ছিলেন তিনি। পালকিতে চেপে কাকিমা যেদিন তাঁদের বাড়ির সমনে নেমেছিলেন, সেদিন প্রথম দর্শনেই সবাই মুগ্ধ হয়ে গেছিল। কে যেন একজন বলেছিল, 'নতুন বউয়ের চোখ দুটো দ্যাখো, কী সুন্দর টানা টানা।' তাঁর সেদিন খুব গর্ব বোধ হয়েছিল কাকিমার জন্যে। আজ বয়েস কাকিমার সেই চোখ দুটোতে বার্ধক্যের ছোপ ধরিয়েছে। সত্যি, বয়স কেন যে কাউকে কাউকে একটু ছাড় দেয় না।

'হ্যাঁ, চোখে ছানি পড়লে শুনেছি অপারেশন ছাড়া কোনও উপায় নেই। আর করতে যখন হবেই, তখন দেরি করে লাভ কী ? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশনটা করিয়ে নেওয়াই তো ভাল।' বললেন অমলেশ।

'বলিস তো বাবা একবার। খোকারে বলে যাস। আমার কথা একদম কানে নেয় না রে। যদি তোর কথা শোনে।'

'ঠিক আছে। বলবক্ষণ।'

'আজই বলবি কিন্তু বাবা !' কাকিমা যেন ধরেই নিয়েছেন অমলেশ বললেই ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে।

অমলেশ তাই হেসে ফেললেন। বললেন, 'বেশ তো। আজই বলব না হয়।'

রাতে খেতে বসে কথাটা তুলতেই অবশ্য প্রশান্ত বলল, 'হ্যাঁ, ছানিটা কাটায়ে দেওয়া দরকার। কদিন ধরে ভাবছি। কিন্তু বোঝ তো এদিকির অবস্থা। ভাল ডাক্তার নেই, এ নেই, তা নেই --। হাসপাতালে কী চিকিচ্ছে হয়, সে তো তুমি জানো। তবে দেব। এবারই ভাবছি অপারেশনটা করিয়ে দেব।'

তারপরও অনেক রাত পর্যন্ত গল্প হল দু-ভায়ের। ছেলেবেলার গল্প। বড় হওয়ার, বর্তমানের।

বিছানায় শুয়েও অমলেশের মনে সেসব দিনের স্মৃতি।

পরদিন সকাল থেকে হইহই-টইটই। এ-বাড়ি থেকে সে-বাড়ি। মামার বাড়িতে মামি, মামাতো ভাই-এর জোরজবরদস্তি, বিনিমাসির বাড়িতে খবর-টবর না রাখার অনুযোগ। না খাইয়ে ছাড়বার পাত্র নন কেউই।

বিনিমাসি তো প্রথমে বলেই বসলেন, 'কী করতে এলি বলত এতদিন পরে ? না এলেই তো পারতিস। এতদিন দেখিনি বলে কি আমাদের চোখ ক্ষয়ে গেছে ?'

অমলেশকে সামাল দিতেই হয়, 'ওহ্ মাসি ! সব জেনেশুনেও তুমি একথা বলছ ?'

'অ্যাই, অ্যাই। কী জানি রে, কী জানি ? তোর অফিসে অনেক কাজ, এ-ও-তা। আসতে সময় পাস না - এই বলবি তো ? মুখ ভেঙে দেব, বুঝলি ? কাজ আর কারও থাকে না ? তুই কি শুধু একা সরকারি চাকরি করিস নাকি ?

'চাকরির কথা তো বলিনি। অন্যান্য কাজও তো থাকে মানুষের। না কি থাকে না ?'

'কী এমন কাজ তোর শুনি ? এত বছরে একবারও আসবার সময় পেলি না -- এমন কী কাজ ? তার চেয়ে সত্যি বলে দিলেই তো হয় যে -- বড়মামার সঙ্গে সেই যে একটু গন্ডগোল হয়েছিল, সে জন্যেই আসিনি মাসি।'

'সে তুমি যা বলার বলো। আসতে পারিনি যখন, যা বলবে -- তাই শুনব।'

মাসি অবশ্য এ নিয়ে বেশি কথা বাড়ালেন না। চলে গেলেন অন্য প্রসঙ্গে। কে, কেমন আছে, কে, কী করছে -- এসব প্রসঙ্গে।

পুরোনো বন্ধু-বান্ধবরাও কি কম যায় ? তাদের বাক্যবাণে তাই জর্জরিত হওয়ার অবস্থা।

তবে আন্তরিকতাটুকু কারও হারিয়ে যায়নি। স্বভাবতই অমলেশ লজ্জিত, আবার তৃপ্তও।

সন্ধের দিকে রজত জোর করে নিয়ে গেল ওর বাড়িতে। আগের সেই মাটির দেওয়াল দেওয়া ঘর আর নেই। সেখানে পাকা বাড়ি উঠেছে।

একসময় খুবই গরিব ছিল রজতরা। দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়াও ভালভাবে জুটত না। এখন যে অবস্থাটা ফিরেছে, তার প্রমাণ ঘরের মধ্যেই রয়েছে।

বসার ঘরে বসে চা-জলখাবার খেতে খেতে সেসব দিনের কথা উঠলও।

শুনতে শুনতে একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলেন অমলেশ।

এ সময়েই কে যেন বলল, 'ভাল আছ অমুদা ?'

অমলেশ সেই আচমকা ডাকে মুখ ফিরিয়েই চমকে উঠলেন তখনই।

রমলা !

হ্যাঁ-না কিছু বলার আগে রমলা মৃদু হাসল। সিঁথিতে সিঁদুর নেই, পরনে আটপৌরে একটা সাদা রঙের শাড়ি। এ যেন অন্য রমলা।

আবেগের ধাক্কাটা কিছুটা সামলে নিয়ে অমলেশ কিছু বলতে চাইলেন, 'তুমি এখানে !'

রমলার মুখের হাসিটা যেন ম্লান তারা হয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল।

'আমি তো অনেকদিন এখানে। এখন এখানেই থাকি।'

অনেকদিন ! কত দিন ? এক বছর ? দু'বছর ? পাঁচ বছর ?

কিন্তু ওই পর্যন্তই। আর কোনও কথা নেই।

খাওয়া-দাওয়ার প্লেটগুলো নিয়ে একটু পরে বরং রমলা চলে গেল।

অমলেশের মনে পড়ল হারিয়ে যাওয়া সেসব দিনের কথা। বন্ধুর বোন হিসাবেই রমলার সঙ্গে তাঁর যা পরিচয়। সেই পরিচয় যে একটু একটু করে কবে ভালবাসায় পরিণত হয়েছিল বুঝতেই পারেনি অমলেশ। কাউকে জানানোও হয়নি তাঁদের সম্পর্কের কথা।

অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েছিল রমলার। অমলেশ তখন দ্বাদশ শ্রেণীর গণ্ডি পেরিয়েছেন। সে বয়সে বাবার ওপরে সম্পূর্ণ নির্ভরতা। বিয়ে করবার বয়সও তো তখন নয়। রমলা একদিন চুপি চুপি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিল।

'সামনের বৈশাখে আমার বিয়ে, শুনেছ তো ?'

'বিয়ে !' যেন হতবাক হয়েছিলেন অমলেশ।

'শোননি কিছু ?'

'কই, না তো !'

রমলা চুপ করে গেছিল। মাথা নীচু করে বসে থেকেছিল অনেকক্ষণ।

কথা বলতে পারেননি অমলেশও। একইভাবে, অনেকক্ষণ। অবশ্য পরিস্থিতি সামাল দিতে তাঁকে বলতে হয়েছিল, 'বেশ তো, বিয়ে হয়ে গেলে তো ...।' গলা ধরে

যাচ্ছিল বারবার।

'দেখতে কেমন ? চাকরিও করে নিশ্চয়।'

রমলা কোনও উত্তর দেয়নি সে কথার। শুধু কেঁদেছিল অঝোরে। শেষে অমলেশকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না অমুদা। তুমি আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে চলো।'

অমলেশ পারেননি। রমলার বিয়ে হয়ে গেছিল দুর্গাপুরের চাকরিওয়ালা ছেলের সঙ্গে।

যতটা জানতেন, সেখানে সুখীই হয়েছিল রমলা। বাড়ি, গাড়ি, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স --। তার তো দাদার ....।

রজত যেন মনের ভাষা পড়তে পারে। সেভাবেই সে বলল, মালার কথা ভাবছিস তো ? ও বছর চারেক হল আমার কাছে চলে এসেছে। কী করবে ? অত বড় বাড়ি, অথচ একা --। তীর্থঙ্কর যখন বেঁচে ছিল, তখনকার কথা আলাদা। এখন কেউ নেই। কখন কী অসুখ-বিসুখ করে তার ঠিক নেই, তাই সব বেচে দিয়ে এখানে চলে এসেছে।'

তারপর আর কথাবার্তা তেমন জমল না। অমলেশের মনে যেন কীসের অস্বস্তি, কাঁটা।

বেরোবার সময় বারান্দায় আবার দেখা হয়ে গেল রমলার সঙ্গে। টুকটাক হাতের কাজ সারছিল সে।

আগে কথা বলল অবশ্য ও-ই, 'চললে ?'

'হ্যাঁ।'

‘কবে এসেছ ? আজ ?’

‘না, গতকাল।’

‘ছেলেমেয়ে ভাল আছে ?’

‘ওই আর কী।’

‘বউদি ?’

‘ভাল।’

অমলেশ অনেক দিন পর ভাল করে তাকালেন রমলার দিকে। বয়সের ছাপ ছাড়া মুখের আদলের তেমন কোনও পরিবর্তন ঘটেনি যেন।

‘কী দেখছ ?’

‘তোমাকে।’

‘আমাকে !’ একটা চাপা হাসি খেলে গেল রমলার মুখে। ‘দেখে অবাক লাগছে, -- না ?’

‘তুমি বদলাওনি তেমন।’

‘তাই ? -- তুমি কিন্তু অনেকটা বদলে গেছ। চেহারায়, ভাষায় --।’

‘কী জানি !’

‘শুনলাম অনেকদিন পরে এলে ?’

‘হ্যাঁ, তা অনেক বছর হয়ে গেল আসি না। কাজ-কর্ম এত যে ...।’

‘খুব জমিয়ে সংসার করছ বলো ?’

‘সংসার !’ অমলেশ মৃদু হাসলেন। ‘হ্যাঁ, বিয়ে যেহেতু করেছিলাম, ছেলেমেয়েও হয়েছে -- তর ওপর আবার তাদের নিয়ে এত বছর যখন কেটে গেল, তখন জমিয়ে সংসার করছি বই কি !’

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রমলা বলল, ‘তোমার সংসারটা একবার গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করে অমুদা। একটা সাজানো-গোছানো সংসার, ছেলে-মেয়ে, তুমি --। তোমাকে নিয়ে ওরকম একটা সংসারের সাধ ছিল তো আমার !’

‘চলো একদিন তা হলে।’

‘কে নিয়ে যাবে ? তুমি ?’

‘যদি তুমি যেতে চাও।’

‘বউয়ের কাছে কী পরিচয় দেবে আমার ? বলতে পারবে এই সেই রমলা, যাকে একদিন তুমি ভালবাসতে ? ছেলেমেয়েদের কী বলবে ?’

‘সে দেখা যাবে। তা ছাড়া বলতেই হবে তার তো কোনও মানে নেই ! তুমি চলো তো আগে।’

ম্লান হাসল রমলা। বলল, ‘না, না, আমি এমনি বলছিলাম। আমার কি কোথাও যাবার জো আছে !’

‘সময় করে চলো একদিন। আমি রজতকে বলে তোমাকে নিয়ে যাব।’

‘ধ্যুস, কী যে বলো তুমি ! এই এত বড় সংসার এখানে, দাদা-বউদি, ভাইপো-ভাইঝি -- এদের ছেড়ে আমার আবার কোথাও যাওয়া ! সময় কোথায় ?’

অমলেশ তবু চেষ্টা করলেন, কিন্তু রাজি করাতে পারলেন না রমলাকে।

সে রাতে বিছানায় শুয়েও অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমাতে পারলেন না অমলেশ। বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা কষ্ট, একটা চাপা যন্ত্রণা। অনেক কিছু না পাবার, অনেককে অনেক কিছু না দিতে পারার। তাঁর মনে পড়ছিল ছেলেবেলাকার সেসব দিনের কথা -- কত স্বপ্নের সেসব দিন। শুধু কি ছেলেবেলা ? সেই যৌবনের দিনগুলো ? তখনও কি রমলার ভালবাসায়, হাজারও স্বপ্নে রঙিন হয়ে থাকেনি জীবনটা ? কোথায় যে হারিয়ে গেল সে দিনগুলো !

মনে মনে অমলেশ স্বপ্নের গাছ পুঁততে লাগলেন সে রাতে। ইচ্ছের গাছও।

◆ সমাপ্ত ◆

|| মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত || ই-বুক ||

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
Suman_ahm@yahoo.com